RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume IX, No. 1 / April, 2024, pp. 57-67.

মানুষ, না মানুষের প্রসঙ্গ

Siddhartha Datta
Assistant Professor,
Department of Bengali,
Chakdaha College,
Chakdaha, Nadia, India.
siddharthadatta9262@gmail.com

Structured Abstract:

প্রেক্ষাপট (Context): আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে অনেকের ধারণায় পশ্চিমবঙ্গের বুকে জন্ম নেওয়া কাব্য-কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি। ছাত্রপাঠ্য সিলেবাসের সীমানাও শিক্ষাবিদেরা নির্বাচিত করে দেন এই বঙ্গের গণ্ডিতে। যদিও বিগত কয়েক বছর যাবত অল্প হলেও পড়ুয়াদের সুযোগ ঘটেছে বাংলাদেশের কবি- সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠে। আজ আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সীমানা পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ নেই; ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই আমাদের এই আলোচনা।

উদ্দেশ্য (Purpose): আন্তর্জালে আষ্টে-পিষ্টে এই নীলগ্রহ আটকা পড়লেও অনেক ঘটনা, অনেক খবর বা অনেক তথ্যই আমাদের অগোচরে রয়ে যায়: যেমন, বিশ্বের চার মহাদেশে ত্রিশটি দেশের প্রায় একশটি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে পঠন-পাঠন, গবেষণা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। পশ্চিমবঙ্গে কতজন বাঙ্গালীর কাছে সেই খবর রয়েছে? বাঙালির মুখের ভাষাকে কেড়ে নিয়ে, জোর করে উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দিতে চেয়ে যে পাকিস্তান হারিয়েছিল তার পুবের ভূখণ্ড, সেই পাকিস্তানের অন্যতম প্রাচীন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগসমূহের মধ্যে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে রয়েছে বাংলা বিভাগ। ১৯৫৩ সালে সূচনা হয়েছিল এই বিভাগের। তার দু'বছর আগে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান মাতৃভাষা 'বাংলা' প্রতিষ্ঠার দাবিতে উত্তাল অস্থির। পাক শাসকের দমন-পীড়ন উপেক্ষা করে ভারত রাষ্ট্রের সাহায্যে গড়ে তুলেছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। পরিণতিতে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ। ১৯৪৭' এর দেশ ভাগ, ভিটেমাটিহারা অসংখ্য মানুষের উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া, পরবর্তীতে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের গতি-

প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। বিভক্ত করে দিয়েছে। তেমনি বিস্তারও ঘটিয়েছে। ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা যুদ্ধ বিশেষ করে পুবের বাংলা সাহিত্য, সংগীত, চিত্র- ভাস্কর্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, সংস্কৃতি -- সর্বত্র এক নতুন অভিমুখ দিয়েছে। ভাষা আন্দোলন পরিণত হয়েছিল গণ আন্দোলনে: সেই প্রভাব, সেই চরিত্র মূলত পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে গড়ে তুলেছে আলাদা ধারা। সেই সৃষ্টি ভৌগোলিক সীমারেখায় বিচ্ছিন্ন হলেও বাঙালির অখন্ড সাহিত্য পরিসরে এপার ওপারের মাঝ প্রাচীরে কোনোভাবেই পৃথক করা যায় না। সতেন সেন, শওকত ওসমান, শামসুর রহমান, নির্মলেন্দুপ্রকাশগুণ চৌধুরী প্রমুখ কেবল ওপারের (বাংলাদেশ) কবি-সাহিত্যিক নন; তাঁদের সৃষ্টির অধিকার সমগ্র বাঙালি জাতির -- পৃথিবীর যে প্রান্তে'ই তাঁদের বসবাস হোক না কেন!

এই সামান্য পরিসরে সেই ভুবন বিস্তারী অঙ্গনে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক সময়কালের বিস্তারিত পরিচয়ের সুযোগ সীমিত। বরং পর্যায়ক্রমে বাংলা সাহিত্যের নানা ধারা থেকে পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি সাহিত্যিকের এক বা একাধিক সৃষ্টির নিবিড় পাঠ ও আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি (Resrarch Methodology): স্রষ্টার স্বীকারোক্তি, তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা, সর্বোপরি তাঁর আপন সৃষ্টির বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা; সেই দিক থেকে গবেষণাপত্রটির অবলম্বন বিশ্লেষণ-পদ্ধতি।

রচনা বা পত্রের ধরণ (Paper Type): গবেষণা পত্র (Research Paper)

ভূমিকা

আমাদের উন্নাসিকতা আমাদের গ্রাস করে, টেনে নিয়ে যায় মূঢ়তার তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে। কূপের ব্যাঙের বদ্ধ জীবনের মতো আমরাই এক ফাঁপা শ্লাঘা পোষণ করি যে সীমানার এপারের সাহিত্য ছাড়া বাংলা সাহিত্যে কোন বিস্তৃতি, বিকাশ বা উৎকৃষ্টতার পরিচয় কেউ কোথাও অতীতেও রাখেনি।বর্তমান বা ভবিষ্যতে সেই সম্ভাবনাও নেই। এই ভ্রান্ত ধারণা তৈরীর উৎস সন্ধান কিন্তু কিছু কঠিন নয়, শিশুপাঠ্য থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র,

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্ত, সুভাষে সুভাষিত।তবে ইদানিং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যগ্রন্থে একজন - দু'জন করে বাংলাদেশের, মানে ওপার বাংলার লেখকেরা জায়গা পেয়েছেন। অথচ সেই কাজটা করা উচিৎ ছিল ভারত ভাগের পরে-পরে না হলেও বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিস্রাবী উত্তাল সময়ের সংযোগ ধরে।বাংলাদেশর শিল্পী - সাহিত্যিক অনেকেই রয়েছেন,যাঁরা নিজ যোগ্যতায় বা সৃষ্টির মাধ্যমে অনায়াসে হতে পারতেন আপামর বাঙালির অতি পরিচিত এবং পাঠ্য গ্রন্থে, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ চালচিত্রে নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্ত, সুভাষের সঙ্গে সঙ্গে সতেন সেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শহীদুল্লাহ কায়সার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মুনির চৌধুরী, মামুনুর রশিদ, শামসুর রহমান, আল মামুদ, বেলাল চৌধুরী, নির্মলেন্দুপ্রকাশ গুণ চৌধুরী-- এঁদের বিযুক্ত করা অসম্ভব।

বিষয়-প্রসঙ্গ

নির্মলেন্দুপ্রকাশ গুণ চৌধুরী কবি, না শিল্পী? যিনি কবি হবেন, তাঁর শিল্পী হতে কোনো বাধা নেই। বরং প্রতিভার বহুমুখ নিয়ে এই গ্রহে অনেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের সৃষ্টির বহু রূপে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। বিস্মিত হয়েছি।যদিও 'বিস্ময়' এর প্রসঙ্গে অনেকেই বলবেন, বিষয়টা মোটেই 'সোনার পাথর বাটি' নয়। ঠিক'ই। রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমুখী প্রতিভার বহুরূপের সান্নিধ্য আমার পেয়েছি। সমৃদ্ধ হয়েছি। সাহিত্যের সব ধারায় তাঁর সফল অবাধ হস্তচারণার পাশাপাশি জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে ষাটোর্ধ্ব রবীন্দ্রনাথ কাগজ - কলমের পাশাপাশি তুলে নিয়েছিলেন রঙ্-তুলি। সুপ্ত প্রতিভা আগ্নেয়গিরির সুপ্তি ভেঙে যেন জেগে উঠেছিল। আমাদের কাছে এক বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি। রবীন্দ্র- প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে তুলনা

নয়, দৃষ্টান্ত মাত্র। নির্মলেন্দুপ্রকাশ গুণ চৌধুরীও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কখনও চিত্রে, কখনও গদ্যে, কখনও কবিতায় তাঁর ভাবনা ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করে চলেছেন এবং এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে অকপটে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর যাপিত জীবনের কথা। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' এর 'মানুষ' কবিতাটির নেপথ্যে রয়ে যাওয়া ইতিহাসকে এই সূত্রে স্মরণ করতে পারি:

"আমি (নির্মলেন্দুপ্রকাশ) ও আবুল হাসান ছিলাম বোহেমিয়ান প্রকৃতির মানুষ। আমাদের কোনো থাকার জায়গা ছিলো না; যেখানে রাত, সেখানে কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম ।আসলে আমরা ঢাকার ফুটপাতের অধিবাসী ছিলাম। মাঝে মাঝে আমরা বন্ধুদের মেসে হানা দিতাম, বিশেষকরে নাট্যজন মামুনুর রশীদের মেসে। কিন্তু এসবের একদিন অবসান হয়, যখন আমি 'দ্য পিপল' পত্রিকায় চাকরি পাই। আমার বেতন ছিল একশ টাকা। চাকরির প্রথম মাসের টাকা দিয়ে আমি প্রথমেই একটা বালিশ ও থালা কিনি। এর আগে আমার কোনো বালিশ বা থালা ছিল না। আমি বালিশ ও থানা নিয়ে নিউ পল্টন লাইনের একটি টিনশেড মেসে উঠি। সময়টা ১৯৭০ সালের শেষের দিকে হবে। তখন ওই মেসের সুখের জীবনে এসে আমার ফুটপাতের জীবনের কথা মনে পড়ত ওই নরম বালিশে শুয়ে। তখন আমি 'মানুষ' কবিতাটি লিখি। 'মানুষ' কবিতাটির মাঝে আমার ব্যক্তিগত জীবনের হাহাকার আছে, চরম বেদনা আছে, নিজের সৃষ্টি চরম দারিদ্র্য আছে, সর্বোপরি আমার ব্যর্থতা আছে।"

বিচার-বিশ্লেষণ: সাতটি স্তবক, একত্রিশ চরণের দীর্ঘ এই কবিতায় কবির জীবন-চর্চা, জীবন-অভিজ্ঞতায় কথা-শরীর গড়ে উঠলেও রসাস্বাদী কবিতা হয়ে উঠতে কোনো বাধা হয়নি। কবির ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাতে গড়ে উঠলেও নিজের ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কয়িত করতে পাঠকেরও কোনো অন্তরায় হয়নি।

আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষগুলো অন্যরকম

হাঁটতে পারে, বসতে পারে, এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়

মানুষগুলো অন্যরকম, সাপে কাটলে দৌড়ে পালায়।

-- তিন চরণের প্রথম স্তবক। প্রথম চরণে 'আমি হয়তো মানুষ নই,' - এই বাক্যটির 'আমি' এখানে 'কবি', 'বক্তা'; যিনি উত্তম পুরুষে বিষয়টি ব্যক্ত করছেন। এই বাক্যে ব্যবহার করছেন' হয়তো' সংশয়সূচক অব্যয়। তাঁর মতে বা মনের মাপ কাঠিতে মানুষের যে সংজ্ঞা, যে মাপ - জোক – তার সঙ্গে নিজেকে মানানসই করতে পারছেন না। মেলাতে পারছেন না। তাই নির্মলেন্দুর মনে এই সংশয়! আবার ওই একই চরণে বহু বচনে 'মানুষগুলো' কে একটা গোষ্ঠীতে কেন্দ্রীভূত করে তিনি জানালেন -- তারা অন্যরকম; মানে ভিন্ন প্রকৃতির। এই ভিন্ন প্রকৃতির বলতে দ্বিতীয় চরণে যা বললেন, তাতে আলাদা করে মানুষের কোনো বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না -- সব মানুষের তা স্বাভাবিক ধর্ম -- 'হাঁটতে পারে', 'বসতে পারে', 'এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়'। তৃতীয় চরণে আবার কবি প্রথম চরণের শেষ দুটি শব্দ দিয়ে শুরু করলেন - 'মানুষগুলো অন্যরকম'; এই পুনরাবৃত্তির পরে একটি তথ্য ছিলেন, এই মানুষগুলো 'সাপে কাটলে দৌড়ে পালায়। লক্ষ করার মতো দুটি বিষয় এখানে রয়েছে:

- সাপে কাটলে -- কাটা -- ক্রিয়া পদ -- কর্তন করা, খন্ডিত করা, ছিন্ন করা।

যেমন - ধান কাটা, পুকুর কাটা, ফাঁড়া কাটা,সুতো কাটা, ছানি কাটা, ছড়া কাটা, সুতো কাটা, ফোঁড়া কাটা - প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে 'কাটা' শব্দটি ব্যবহার যেমন হয়, তেমনি সাপের ছোবল মারা, দংশন বা কামড়ানোর সমার্থশব্দ হিসাবে 'সাপে কাটা' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে।

এখানে মজার কথা; অন্যরকম সেই মানুষদের সর্পদংশনের প্রতিক্রিয়া হলো, 'দৌড়ে পালায়'। সমস্ত প্রাণী জগতের মধ্যে আত্মরক্ষার যে স্বাভাবিক প্রবণতা বা পাল্টা আঘাত - প্রত্যাঘাতের যে ইচ্ছে বা শক্তি এই মানুষগুলোর মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে না। ক্ষমতা হীনতা বা ইচ্ছাহীনতা'র কারণেও হয়তো এই মানুষগুলো অন্যরকম।

"আমি হয়তো মানুষ নই" -- প্রথম স্তবকের মতো এই সংশয়বাচক বাক্য দিয়ে শুরু হচ্ছে সাত চরণের দ্বিতীয় স্তবকটি।

প্রশ্ন জাগে, সেই 'না - মানুষ ' ব্যক্তিটি কী করে ?

কবি'ই উত্তর দিলেন: সারাদিন গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

▪গাছ = প্রাণ আছে কিন্তু চলৎশক্তিরা রহিত। শাখা--প্রশাখা, ফুল - ফল - পাতা নড়ে, কিন্তু নিজ শক্তি বা ক্ষমতায় নয়। ঝড় - বাতাসে সচল হয়। বাইরের শক্তি আলোড়িত করে।

কবিও দাঁড়িয়ে থাকেন সেই গাছের: অচল, স্থির, স্থবির হয়ে। এবং এরই মধ্যে অনুভূতি শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হন: কারণ সর্পভীতি দূরের কথা,সাপের দংশনেও কবি টের (বুঝতে) পারেন না। আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো সিনেমা বা বিনোদনের আনন্দ অনুভব করে গান গেয়ে ওঠেন না। অভাবী মানুষের একজন হয়ে নয়, নিত্য অভাবের মধ্যে দিন কাটানো কবি বরফ দেওয়া সস্থা সরবত'ও কপালে জোটে না। সেখানে দামী কোম্পানির কোল্ড ড্রিঙ্কস তো দূরের কথা! সিনেমা বা বিনোদনের জগতে ডুবে থাকা, তার মধ্যে বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পেয়ে উল্লাসে মেতে ওঠা; প্রাণের আনন্দে গান গেয়ে ওঠা, খাদ্য-পানীয়ে ডুবে থাকা, উৎসবে-আনন্দে গা-ভাসানো যেমন ভোগবাদীশ্রেণীর বেঁচে থাকার শর্ত; সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কবির মনে হচ্ছে - এই সব না করেও তিনি কি করে বেঁচে আছেন? বেঁচে আছেন দল ছাড়া মানুষের মতো; কাজে

নয়, অকাজে - ছবি এঁকে। সকাল - দুপুর, এমন কি সারাদিন এই ভাবে বেঁচে থাকা বিস্ময়ের। নিজে'ই অবাক হচ্ছে যাচ্ছেন। তাঁর অবাক লাগছে; এই ভাবে বেঁচে থাকা যায়?

কবিতার তৃতীয় স্তবকের শুরুও, 'আমি হয়তো মানুষ নই' -- সেই সংশয়বাক বাক্য দিয়ে। চার চরণের এই স্তবকটিতে তাঁর নিজেকে এই মানুষ মনে না হওয়ার কারণ তিনি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন; মানুষ মাত্রেই সংসারী। সামাজিক। আদিম স্তর অতিক্রম করে লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের পাতা, বাকল থেকে ক্রমে বস্ত্র ধারণ করেছে মানুষ। জুতো এসেছে আধুনিক স্তরে; সভ্য- আধুনিক মানুষ জুতো'য় পা ঢাকে। তাহলে মানুষের আকার থাকলে চলবে না, 'মানুষ' হয়ে উঠতে হলে পায়ে জুতো থাকতেই হবে, সভ্যতাকে ধারণ এবং বহন করে মানুষ হতে হবে। সেই সঙ্গে বাড়ি - ঘর, নিজস্ব নারী আর সেই নিজস্ব নারীর গর্ভে পেটের পটে আঁকা হতো কোনো শিশু অর্থাৎ গৃহ, গৃহিণী আর গৃহিণীর গর্ভে সন্তান -- এই সবই সুখের শর্ত। ভালো থাকার উপায়। যদিও এই সব শর্তের পূরণ কবির পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হয়নি; তাই কবির মনে সংশয় "আমি হয়তো মানুষ নাই,"! এই সংশয়ের মধ্যেই ছয় চরণের চতুর্থ স্তবকটিও শুরু হয়েছে এবং এই স্তবকটিতে গড় মানুষের গুণাগুন ব্যক্ত হয়েছে -

> মানুষগুলো অন্যরকম, হাত থাকবে
> নাক থাকবে, তোমার মতো চোখ থাকবে,
> নিকেল মাখা কী সুন্দর চোখ থাকবে
> ভালোবাসার কথা দিলেই কথা রাখবে।

-- এই স্তবকেই প্রথম লক্ষ করা গেল, সমষ্টি থেকে কবি পৃথকভাবে ব্যাষ্টি'র কথা উল্লেখ করলেন, 'তোমার মতো চোখ থাকবে,' - সেই চোখ সম্পর্কে কবি'র মন্তব্য, নিকেল মাখা কী সুন্দর চোখ'। চোখের অনুষঙ্গে প্রথমেই 'কাজল' এর কথা মনে আসে। 'কাজল মাখা', 'কাজল কালো', 'কাজল টানা' চোখের চিত্রকল্প বহু কবিই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কবি নির্মলেন্দু গুণ

নতুন শব্দের নিয়োজন ঘটিয়েছেন, "নিকেল মাখা"। নিকেল ধাতুটি মূলত ক্ষয়রোধকারী সংকর ধাতু তৈরীতে ব্যবহার করা হয়: স্টেইনলেস স্টিল, মুদ্রা, ঘড়ির ধাতব বেল্ট, চশমার ডঁটিতে এই উজ্জ্বল ধাতুর ব্যবহার হয়। কিন্তু চোখে? কল্পনা করা যেতে পারে কৃষ্ণবর্ণের অক্ষিপল্লবের সীমানা বরাবর নিকেলে উজ্জ্বল প্রলেপে চোখ যেন আরও দ্যুতিময়। আর সেই অন্যরকম মানুষগুলো ভালোবাসার কথা দিলেই, সেই কথা পালন করবে। অন্যথা হবে না। এই মানুষজনের সঙ্গে কবির পার্থক্য কোথায় ? যেন কবি নিজের সংশয় থেকে' ই প্রশ্ন তুলেছেন; 'মানুষ হলে আকাশ দেখে হাসব কেন ?' ব্যস্ত পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষদের আকাশ দেখার অবকাশ কোথায় ? হাসি'র কথা তো অনেক পরে! বেকার বা কর্মহীন বলে'ই কি আকাশ দেখেন ? আকাশের বিস্তার, নীল রঙের নানা বৈচিত্র্য বা মেঘের আনাগোনা কবির মনে কি অনন্দ উৎপাদন করে ? রৌদ্র-ছায়ার খেলা কি তাঁর মনে অন্য অনুভূতি জাগায় ? তারই বহিঃপ্রকাশ ফুটে ওঠে কবির মুখের হাসিতে ? কবির এই প্রশ্নের মধ্যে কোন্ অন্তর্নিহিত অর্থ লুকিয়ে আছে ? আত্মসমালোচনা, নিন্দা, না প্রশস্তি ? কবি-শিল্পীর সঙ্গে রয়েছে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। প্রকৃতির পরিবর্তনে মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ওঠে নানা অনুরণন। কবি যে গড়পড়তা মানুষের থেকে আলাদা -- কবি যেন সেই বিষয়কে বুঝিয়ে দিলেন।

প্রথম চারটে স্তবকের মতো পাঁচ চরণের পঞ্চম স্তবকের সূচনায় কিন্তু সংশয় প্রকাশী বাক্যটি অনুপস্থিত। বরং সংশয় মুছে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এখানে অপ্রাপ্তির বেদনা আর অভিমানী মনের আক্ষেপ যেন গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসেছে:

> মানুষ হলে উরুর মধ্যে দাগ থাকতো,
>
> চোখের মধ্যে অভিমানের রাগ থাকতো,
>
> বাবা থাকতো, বোন থাকতো,

ভালবাসার লোক থাকতো

হঠাৎ করে মরে যাবার ভয় থাকতো।

মানুষ মাত্রে'ই সামাজিক জীব। মানুষ হলে যে সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন বা আপন জনের উপস্থিতিতে তৈরি হওয়া একটা বলয়, একটা সম্পূর্ণ বৃত্ত -- বাবা, বোন, ভালোবাসার লোকের উপস্থিতি, যা সাধারণ মানুষের থাকলেও কবির জীবনে অনুপস্থিত। অনুপস্থিত আর সব মানুষের মতো 'উরুর মাঝে দাগ' স্ট্রেচ মার্ক। মানব শরীরের নানা পরিবর্তন - বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোনো অঙ্গের বৃদ্ধিতে তার চামড়া বা ত্বকে সৃষ্টি হয় সার্পিল দাগ। আবার "দাগ" শব্দের প্রতিশব্দে চিহ্ন, আঁচড়, কলঙ্ক-রেখার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তেমনি গর্ভধারণ কালে নারী-শরীরে, বিশেষ করে উদরে তৈরি হয় উপরে স্ট্রেচ মার্ক। যেন দাগ বা চিহ্ন সেই উর্বরতার প্রতীককেই বহন করে।

কিন্তু পরমুহূর্তে কবি প্রিয়জন বিহীন যে জীবনে ছবি এঁকেছিলেন, তাকেই বদলে দিলেন। :

মানুষ হলে তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখা

আর হতো না,....

-- এ যেন ব্যজস্তুতি! একদিকে 'মানুষ নই' ঘোষণাকারী সংশয়াচ্ছন্ন মানুষটিই তাঁর প্রেমের পরিচয়কেই কবিতার শরীরে গেঁথে দিলেন। তাঁর কবি হয়ে ওঠার আড়ালে সেই 'তুমি' র উপস্থিতি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যখন বেঁচে থাকার প্রশ্নে, অস্তিত্বের রক্ষায় সেই ভালোবাসার মানুষটিকে স্বীকৃতি জানান --

...তোমাকে ছাড়া সারাটা রাত

বেঁচে থাকাটা আর হতো না।

উপসংহার

কবির এই জীবন-মৃত্যুর মাঝে রয়েছে প্রেম।আসলে প্রেম-শূন্য মানুষদের মধ্যে কবি একা। এবং অন্যরকম। 'মানুষগুলো'র সঙ্গে কবির পার্থক্য এখানেই; মোহ, লোভ আর যান্ত্রিকতায় বদ্ধ যে জীবন, সেই জীবন সম্পদের সঞ্চয়ে এতটাই নিবিষ্ট যে প্রকৃত 'সম্পদ' সন্ধান অধরাই থেকে যায়! কবিতার শেষ তিন চরণে সেই তথাকথিত 'মানুষগুলো'র সঙ্গে কোথায় পার্থক্য, তা স্পষ্ট করে দিলেন:

> মানুষগুলো সাপে কাটলে দৌড়ে পালায়;
> অথচ আমি সাপ দেখলে এগিয়ে যাই,
> অবহেলায় মানুষ ভেবে জাপটে ধরি।

-- ভয় আর নির্ভয়ের প্রশ্নেই কবি আর 'মানুষগুলো'র মধ্যে পার্থক্য তৈরী হয়ে যাচ্ছে। প্রতিরোধ বা প্রত্যাঘাতের ক্ষমতাহীন এই মানুষগুলোর সাপে কাটলে দৌড়ে পালানোর প্রসঙ্গ নির্মলেন্দু গুণ মানুষ কবিতার প্রথম স্তবকেই জানিয়েছেন। সেখানে সাপের কামড়ে কবি অনুভূতিশূন্য। আবার শেষস্তবকে সাপের সামনে মানুষগুলোর আচরণের কোনো পরিবর্তন নেই,অথচ ভয়-ডরহীন কবি সাপ দেখলে এগিয়ে যান এবং জাপটে ধরেন। কবিতায় এই 'জাপটে' শব্দের ব্যবহার আমাদের কাছে এক গভীরতর অর্থের কাছে নিয়ে যায় :যেমন আক্ষরিকভাবে 'জড়ানো', 'বেষ্টন' ইত্যাদি শব্দের অর্থ এক হলেও 'জাপটে' শব্দ রচনা করে আরও অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। অতর্কিতে একজনকে নিজের শরীরে টেনে নেওয়া বা মিশিয়ে দেওয়ার মধ্যে 'জাপটানো', 'জাপটে ধরা' শব্দগুলো যেন দৃশ্যমান করে তোলে। কিন্তু কেমনভাবে ? অবজ্ঞা, অনাদরের সমার্থক 'অবহেলা' শব্দটিকে কবি ব্যবহার করে বোঝাতে চাইলেন, কোনো

ঘনিষ্ঠ বা নিরিড় সম্পর্কে নয়, নিছক অবজ্ঞায়-অবহেলায় তিনি সর্পরূপী মৃত্যুকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন আর তা সম্ভব হয় প্রকৃতি আর নারীকে ভালোবেসে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি (References)

গুণ, নির্মলেন্দু। আত্মকথা। বাংলা প্রকাশ, বাংলাদেশ।

গুণ, নির্মলেন্দু। নির্মলেন্দু গুণ রচনাবলী, ১ম-৩য় খন্ড। কাকলী প্রকাশনী, বাংলাদেশ।

গুণ, নির্মলেন্দু। প্রেমাংশুর রক্ত চাই। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, বাংলাদেশ।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। বাংলাদেশের সাহিত্য। আজকাল প্রকাশনী, বাংলাদেশ।

ত্রিপাঠী, দীপ্তি। আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়। দে'জ প্রকাশনী, ভারতবর্ষ।